দৈনিক বাংলা 02
তারিখ 19 NOV 1997 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

প্রাথমিক বৃত্তির কোটা ঃ একটি আবেদন

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। এই মেরুদন্ড শক্ত না হলে কোন জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বা উন্নত হতে পারে না। এই সত্য উপলব্ধি করেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশটি দরিদ্র। এই দরিদ্র দেশে শিক্ষার বাধ্য-বাধকতার অনুষঙ্গ হিসাবেই ব্যাপক জন-গণের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে আকর্ষ-ণের জন্য নানাভাবে সরকার তাদের সাহায্য দিচ্ছেন, প্রেরণা যোগাচ্ছেন, উৎ-সাহিত করছেন। শুধু অভিভাবক নয়, উৎসাহিত করছেন তাদের সন্তান কোমল-মতি ছাত্রছাত্রীদেরও। ছাত্র বৃত্তি এমনি একটি উৎসাহদানমূলক পদক্ষেপ। এই বৃত্তি প্রবর্তন করা হয়েছে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই। প্রাথমিক অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যা-লয় পর্যায়ে প্রতি ইউনিয়নে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা যেমন আর্থিক দিকে উপকৃত হচ্ছে তেমনি লেখাপড়ার প্রতি বাড়ছে তাদের আগ্রহ এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে পাঠে মনোযোগ দেওয়ার ফলে বিকাশ ঘটছে তাদের মেধার। তাই ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি-দানের ব্যবস্থাটা শিক্ষার বিস্তার ও উন্নয়নে একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। তবে বর্ত-মানে যে পরিমাণে বা সংখ্যায় বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে তা মনে হয় অপর্যাপ্ত। কেননা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ফলে প্রতিটি ইউনিয়নে যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে তেমনি বাড়ছে ছাত্রসংখ্যা। নতুন পুরাতন মিলিয়ে এখন প্রায় প্রত্যেকটি ইউনিয়নে ৫/৬টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং প্রতি বিদ্যালয় থেকে ১২/১৩ জন করে ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করছে। এতে ইউনিয়ন প্রতি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৬০/৭০ জনের মতো। কিন্তু তাদের মধ্যে বৃত্তি পাচ্ছে মাত্র দুজন অর্থাৎ একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রী। এ দুজন ছাড়াও আরো অনেক ছাত্রছাত্রীই হয়তো পরীক্ষায় খুব ভালো ফল করছে। কিন্তু তারা বৃত্তি না পেয়ে হচ্ছে নিরুৎ-সাহিত। সুতরাং আমরা মনে করি বৃত্তির সংখ্যা ইউনিয়ন প্রতি দুটিতে সীমিত না রেখে বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে আরো বাড়ানো উচিত। প্রাথ-মিক শিক্ষার বিস্তারে ও উন্নয়নে এ বৃদ্ধির ফল শুভই হবে। এ বিষয়ে শিক্ষা বিভা-গীয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির কোটা আরো বাড়া-নোর জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

আঃ রহমান
সিদ্ধিরগঞ্জ, নাঃগঞ্জ।

চাঁদপুরে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের দুর্ভোগ

চাঁদপুর জেলার মতলব, কচুয়া, হাজীগঞ্জ, শাহরাস্তি, হাইমচর, ফরিদ-গঞ্জ ও চাঁদপুর সদর থানার প্রায় সাত শতাধিক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা বেতন–ভাতা না পেয়ে চরম আর্থিক কষ্টে জীবন যাপন করছে। সরকারী মর্যদা পাওয়ার আশায় কিছু শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবত নিজেদের টাকায় জমি ক্রয় করে এবং ঘর নির্মাণ করে বিনা বেতনে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষাদান করছেন। বিদ্যালয়ের আসাববপত্র তারা নিজেদের টাকায় ক্রয় করেন এবং নিজ খরচেই স্কুলগুলোকে শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশনও করিয়েছেন। ইতিপূর্বে সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে সব রেজিষ্ট্যার্ডকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকারা থানা শিক্ষা অফি–সের মাধ্যমে স্থানীয় সোনালী ব্যাংকে তাঁদের মাসিক বেতন তোলার জন্যে একাউন্ট খুলবেন। কিন্তু ঘোষণা অনুযায়ী ব্যাংকে হিসাব খুলেও বেতন পাচ্ছেন না।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই শিক্ষক–শিক্ষিকারা নিজেরা স্কুল ঘর তৈরি, আসবাবপত্র ক্রয় ও লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্র–ছাত্রী এনে শুধু স্কুলই পরিচালনা করে আসছেন তাই নয়, থানা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে সরকারী নির্দেশে ছাত্র–ছাত্রীদের তারা অনেকবার পরীক্ষাও নিয়েছেন। আরও উল্লেখ্য, প্রতি গ্রামে একটি করে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় করে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের বেতন–ভাতা প্রদানা করা হবে বলেও সরকার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতেই বেকার শিক্ষিত যুবক–যুবতীরা যাদের মধ্যে অনেক আইএ, বিএ ডিগ্রীধারীও রয়েছে– তারা ১৫–২০ হাজার টাকা খরচ করে এসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। আজ ৪/৫ বৎসর গত হলেও এখনও পর্যন্ত কোন বেতন–ভাতা পাচ্ছেন না–এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।–এ অবস্থা চলতে থাকলে সরকারের দু' হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্যে শিক্ষা' কর্মসূচীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত তা বলাই বাহুল্য।

অতএব এ ধরনের বিদ্যালয় বিশেষ করে চাঁদপুর জেলার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরকারীকরণ করার জন্যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ শাহ আলাম সরকার
প্রযত্নে–ফজর আলী সরকার
কালিয়াইশ, আশ্বিনপুর,
মতলব, চাঁদপুর।

জনমত জনমত